সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে নাট্য-উপাদান

অলোক কুমার চক্রবর্তী*

সারসংক্ষেপ : শ্রীচৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব ক্রিয়া-কর্মে বৈষ্ণবীয় রসধারার বিচিত্র সন্নিবেশ ঘটেছিল যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থায় যেমন দুর্দান্ত অভিঘাত দিয়েছিলেন, তেমনি বহমান সংস্কৃতির সাথে অত্যন্ত সুচারুভাবে সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ছিল নাটকীয়তায় পূর্ণ। তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মযজ্ঞ অনুসরণ করলে এও দেখা যায় বৈষ্ণবীয় মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র নাট্যানুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন, যা ছিল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে এই কর্মযোগীর বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলো, বাংলা নাটকের ইতিহাসের ধারায় অপূর্ব অবদান রেখেছে। এ প্রবন্ধে, চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে ব্যবহৃত বিচিত্র নাট্য-উপাদানের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পর্যাপ্ত সাহিত্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত না হলেও অনুমান করা যায়, প্রাচীন বাংলার জীবন ও জনপদের সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের প্রভাব পড়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈদিক শিক্ষাধারার একটি নির্দিষ্ট পাঠ-কার্যক্রম বিশেষ শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও গোটা ভারতবর্ষে তার একটি পরিচিতি ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায়োগিক স্তরে আচার্য ভরত এবং তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের উপযোগিতা ব্যাপক আকারে ছিল বলেই মনে হয়। সেইসূত্রে বাংলায় বিধিবদ্ধ নাট্যক্রিয়ার নানাবিধ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে নানা বাদ্য-গীত সহযোগে অভিনয় যে হতো তার প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়। যেহেতু প্রাচীনকাল হতেই যাত্রা কথাটি চলে আসছে এবং অনেকটা অপরিহার্য হিসেবে মানুষেরা এই বিশেষ ধারাকে বহন করে নিয়ে এসেছে। শুরুতে নাচ-গানের সাথে দেবতার মাহাত্ম্য ও কৃপা-প্রার্থনার প্রসঙ্গ থাকলেও কালক্রমে দেবলীলা অভিনীত হতে থাকে। বাংলা নাট্যধারার উৎস-অনুসন্ধানে প্রকৃত অর্থেই যাত্রা বা দেবযাত্রা এক অনন্য তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়। প্রাচীন বাংলার নাট্যধারা সম্পর্কে যৎসামান্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও মধ্যযুগ আমাদের ভরিয়ে রেখেছে বিশাল ও বিচিত্র নাট্যভাণ্ডার দিয়ে। Performance style বা বিভিন্ন অভিনয়-রীতি এবং একাধিক নাট্যধারা-সঞ্চিত

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.13

মধ্যযুগের সৃষ্টিভাণ্ডার। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *শূণ্যপুরাণ*, বিভিন্ন *মঙ্গলকাব্য*, অনুদিত *রামায়ণ-মহাভারত*, পালা, গীতিকা, পাঁচালী, নাটগীত, ঝুমুর, অস্কীয়া নাট, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা, যাত্রা, ঘাটু প্রভৃতি ধারা মধ্যযুগের নাট্যধারার বিচিত্র রীতিকে বহন করে চলেছে এবং আরও অনেক নাট্যধারা মধ্যযুগের বাংলা থিয়েটারেরও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তবে এ সব নাট্যধারায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষ্ণকথার প্রাধান্য বেশি। কৃষ্ণকথার এই ধারা প্রাচীন যুগ হতেই আমরা দেখতে পাই এবং তার যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণও রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষ্ণকথাকে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিতে স্থায়ী ও শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর সহযোগীরা।

নাট্য ও নাট্যাভিনয়ের প্রাচীনতম ধারা যাত্রা এবং এর সৃষ্টি-উৎসের অনুসন্ধানে দেখা যায়, অতীতে কোন কাঙ্ক্ষিত বা আরাধ্য দেবতার লীলা উপলক্ষ্যে ভক্তেরা নৃত্য-বাদ্য-গীত দিয়ে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করতো। এর অন্তর্মূলে ছিল ধর্মীয় সুধারস পরিবেশন ও আস্বাদন। মূলত এ সব অভিনয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধন করা হতো, তাহলো – দেব-দেবীকে উপলব্ধি করা এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই ধারার ক্রিয়াশীলতা আমরা মধ্যযুগে এসেও একইভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি। মধ্যযুগের অধিকাংশ নাট্যধারার সৃজন-উৎসের মর্মমূলে রয়েছে উল্লিখিত অভিপ্রায় এবং এর কারণ – জীবনাচরণের সাথে ধর্মের অচ্ছেদ্য যে সম্পর্ক রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর *Music of South Asian Peoples* গ্রন্থে এ বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য :

> but also all kinds of functions and works in India used to be performed with the idea and ideal of religion which helped divinize the lives and works of the peoples of the society. (Swami pragganananda, 1979 : 224)

সামাজিক বিনোদনের ক্ষেত্রেও যে এর বিশাল প্রভাব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। তবে বর্তমানে বিনোদনের যে ধারা তার সাথে উল্লিখিত পর্যায়ের বিনোদন ধারার রয়েছে সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য।

ক.

প্রাচীন যুগের তুলনায় মধ্যযুগের নাট্যরীতিতে সংযোজিত হয়েছিল নানাবিধ নাট্য ও অভিনয়রীতি। কৃষ্ণকথাকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল নাট্যধারার পরিচয় আমরা প্রাচীন যুগ হতেই বিকশিত হতে দেখি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম যেমন সুগঠিত হয় তেমনি কৃষ্ণকথারও পরিমার্জিত রূপ উপস্থাপিত হতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনের পূর্বে বাংলা নাট্যধারার বিষয়ভাবে কৃষ্ণকাহিনি যেভাবে উপস্থিত ছিল পরবর্তীকালে তার রূপ-আঙ্গিক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়ে উপস্থাপিত হতে শুরু করেছিল। ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ারের সময় বাংলা নাট্যধারায়ও এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাই

কৃষ্ণকথাকে তাত্ত্বিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। 'তাত্ত্বিক' শব্দটির প্রয়োগ এই মর্মে যে, ধর্মমত প্রসারের সাথে সাথে নাট্যরীতির বিভিন্ন আঙ্গিকে কৃষ্ণকাহিনির বা তার তাত্ত্বিক প্রয়োগের দিকটির উপস্থিতি বাড়তে থাকে এবং বৈষ্ণবীয় মত ও দর্শনের সাথে বাংলা নাটকের একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সেতুবন্ধনে বৈষ্ণবেরা বিচক্ষণতার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মতকে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারবস্তু 'কৃষ্ণভক্তি' — তার প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে 'কীর্তন'। 'কীর্তন' শব্দটির উল্লেখ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু শাস্ত্র-গ্রন্থে পাওয়া যায়। যার শাব্দিক অর্থ — কীর্তি বা প্রশংসা করা। এই ধারায় দেখা যায় নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অভিনয় সহযোগে কীর্তন অনুষ্ঠিত হতে। কীর্তনের এক অনন্য দিক হচ্ছে — এর নাটকীয়তা; প্রাক-মধ্যযুগেও প্রচলিত রীতিতেই কীর্তন অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে তা ছিল মিশ্র এবং বিষয়ভাবে যথেষ্ট অভাব ছিল যুথবদ্ধতার। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত কীর্তন হলো — 'নাম সঙ্কীর্তন' ও 'নগর সঙ্কীর্তন।' এ-সব কীর্তন অনুষ্ঠিত হতো গণমানুষকে কেন্দ্র করে। এর ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে এক ব্যাপক গণজাগরণ ঘটেছিল। অনেক গবেষক এই জাগরণকে 'চৈতন্য রেনেসাঁস'[১] বলে অভিহিত করেছেন। কীর্তনের বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণবন্দনার প্রাধান্য এবং ভক্তি-রস ও প্রেমের আধিক্য থাকলেও কীর্তনের হৃদয়মথিত ধারায় যে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হতো তাতে বিভিন্ন লীলা বিস্তারের ঘটনাকে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হতো। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে 'নীলাচল পর্বে' তিনি কীর্তনের আঙ্গিকে বহু পরিবর্তন আনেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র 'নগরকীর্তন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এতে ছিল সুস্পষ্ট নাট্যাভিনয় রীতির প্রয়োগ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায়ও বিভিন্ন সময়ে আমরা তাঁকে নাট্যআয়োজন এবং অভিনয় করতে দেখি। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন নাট্য রচনায় নাট্যগ্রন্থ পঠন-পাঠনে তাঁর উৎসাহ ছিল। আমাদের ধারণা হয়, তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম চৈতন্যযুগ এবং উত্তর যুগে যে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল তার মূলে ছিল নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা। কারণ, বৈষ্ণবধর্মে যে নৃত্য-বাদ্য-গীত এবং নাট্যলীলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো, তার মূলে ছিল গণসংযোগ। নাটকের ক্ষেত্রে আধুনিক যে ধারণা — নাটকের ক্রিয়াপ্রকৌশলের অভিঘাতে সমাজের নানা অসঙ্গতি, নতুন দর্শন বা মতামত যেমন তুলে ধরা যায়, তেমনি এ-সব তথ্যকে ছড়িয়ে দিয়ে গণমনে প্রভাব সঞ্চার করা যায়, পরিবর্তনও আনা যায়। এই ধারণার সার্থক রূপকার শ্রীচৈতন্যদেব। ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা লালনকারী শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত 'নগর সঙ্কীর্তনে' সব বিধি-নিষেধ উপেক্ষিত হলো, উন্মুক্ত করা হলো সবার জন্য। গণসংহতির এই তাত্ত্বিক দিকও শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর পূর্বে রচিত নাট্যগ্রন্থ পাঠ ও নাট্য-উপলব্ধি থেকে; আমাদের এই ধারণা। এই ধারণার মূলে রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচিত্র জীবনীগ্রন্থ, যেমন : কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*, মুরারী গুপ্তের *কড়চা*, লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল*, নিত্যানন্দ দাসের *চৈতন্যচরিত*, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*,

শিশিরকুমার ঘোষের *অমিয়নিমাইচরিত*, কবিকর্ণপুরের *চৈতন্যচরিতামৃতম্*, *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*, *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্*, চূড়ামণি দাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*, বৈষ্ণব পদকারদের রচিত বিচিত্র আঙ্গিকের *বৈষ্ণব পদাবলি* এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন তত্ত্ববিদদের নানাবিধ বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ।

খ.

নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বলা যায়, প্রত্যেক জাতিসত্তাই ধীরে ধীরে সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বলয় তৈরি করে নেয় এবং এবং বিস্ময়কর বিষয় হলো – শুরু থেকেই একটি জাতির সংস্কৃতিময় জীবনাচরণে নাট্যক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। এই নাট্যক্রিয়ায় থাকে সুস্পষ্ট শরীরীব্যঞ্জনা। গবেষক Sheldon Cheney তাঁর *Theatre : Three Thousand years*-এর Introduction-এ যে মত প্রদান করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ :

> Whenever and wherever the human have proposed beyond the mere struggle for existence, to god's recreation and self-expression. There has been theatre in some sense. (Sheldon, 1952 : Introduction)

বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের দিকে তাকালে আমরা বাংলা নাটকের এক অভূতপূর্ব সংজ্ঞা-কাঠামো দাঁড় করাতে পারি। এই সংজ্ঞা-কাঠামোর ভিত্তিভূমি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। বাংলা ভাষায় 'নাটক' অভিধাটি সংস্কৃত হতে প্রাপ্ত হলেও এবং সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকের দশটি রূপভেদকল্পে প্রকাশ করা হলেও বাংলা নাটকের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের সাথে তার বিশেষ কোনো মিল চোখে পড়ে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট, তাহলো – বাংলা নাটক সম্পর্কে অধিকাংশ নাট্যজন সে ধারণা পোষণ করেন, অর্থাৎ বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সৃষ্টির অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে রুশদেশীয় গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেডেফ (১৭৪৯ - ১৮১৭) এবং তত্ত্বগতভাবে ঔপনিবেশী ধ্যান-ধারণা প্রচার করলেও আমরা মনে করি, বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। যদিও অজিতকুমার ঘোষ তাঁর *বাংলা নাটকের ইতিহাস* গ্রন্থে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনায় 'সহস্র বৎসর পূর্বে নাট্যশালার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল'। (অজিত, ২০০৫ : ১৩) বলে যে আক্ষেপ করেছেন, তার এই আক্ষেপের কোনো কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। মধ্যযুগের বিশাল নাট্যভাণ্ডার এবং তার অভিনয়ের দিকে তাকালে মুখ্যত আপেক্ষের কোনো কারণ থাকে না এবং আমরাও বাংলা নাটক সম্পর্কে তত্ত্বগত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে পারি। উপর্যুক্ত মন্তব্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, বাংলা নাটকের শরীরী কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য। আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে যে ত্রিমাত্রিক ক্রিয়া অর্থাৎ স্থান, অভিনেতা ও দর্শক সমন্বয়ের যে নাট্যক্রিয়া সংঘটিত হয়; এই ত্রিমাত্রিক নাট্যক্রিয়ার সংগঠন মধ্যযুগের নাট্যক্রিয়ায় দুর্লক্ষ্যণীয় নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে নাট্যক্রিয়া তথা নাট্য-উপাদান। মধ্যযুগের যে সময়কাল আমাদের

আলোচনার বিষয়বস্তু, তখন 'নাটক' শব্দটির যথার্থ অর্থে প্রচলন ঘটেনি। নাট্যক্রিয়া তখন নাটগীত, নাট্য, নৃত্য, লীলাবিলাস ইত্যাদি নামে অনুষ্ঠিত হতো। আধুনিক থিয়েটারের যে মূল উপাদান, তা যেমন মধ্যযুগীয় নাট্যক্রিয়ায় ছিল, তেমনি আরও সংযুক্ত ছিল স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য-গীত ও বাদ্য। আধুনিক নাট্যক্রিয়ার সাথে মধ্যযুগের নাট্যক্রিয়ায় একটিই মৌলিক পার্থক্য পরিদৃশ্যমান হয়, তাহলো – পাণ্ডুলিপি। মধ্যযুগের নাট্যরীতিতে পাণ্ডুলিপির ব্যবহার দেখা যায় না; তখন ব্যবহৃত হতো মৌখিক রীতি। 'শোভাযাত্রা নাট্য' ছিল এক অন্যতম মাধ্যম। কারণ, এই নাট্যলীলার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় সুধারস আস্বাদন। ধর্মীয় আচার বা কৃত্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে আরাধ্য দেব-দেবীকে রথে বসিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হতো অথবা বিশেষ-বিশেষ তিথি বা ক্ষণ অনুসারে মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসা হতো। এই শোভাযাত্রায় বা দেবমন্দিরে অভিনেতারা নানান পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে অভিনয় করতেন এবং এতে থাকতো নৃত্য-গীত ও বাদ্যের সমাহার। অভিনেতাদের মধ্যে দিব্যভাবের আবেশ ঘটতো। এই আবেশের মূলে ছিল অভিনেতাদের একাগ্রতা এবং বিচিত্র সাজ-সজ্জার নটভঙ্গি। নটভঙ্গিতে যে দিব্যভাবের আবেশ ঘটতো তার মর্মমূলে ছিল আরাধ্য দেব-দেবীতে ঐকান্তিক প্রেম এবং তাঁদের সন্তুষ্টি লাভ করার প্রয়াস। অন্তত মঙ্গলকাব্যের নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একথা বলা যায়। কিন্তু বাঙালির সবচেয়ে বড় ভাবসম্পদ শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যক্রিয়ার উপলক্ষ্য ভিন্নতর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে প্রেমরূপী মহাভাবকান্তির সাক্ষাৎ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর নাট্যক্রিয়াও ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তাহলো – গৌড়ীয় বৈষ্ণবজনের সাক্ষাৎ ভজনের অংশ হিসেবে উপস্থাপন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারকথা হলো – কৃষ্ণপ্রেম অর্জন। এই কৃষ্ণপ্রেম অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে ভক্তি। ভক্তির পূর্ণ আধার প্রেমরূপী শ্রীরাধা। লীলাবাদের জন্মক্ষণ হতেই রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক স্থাপিত। এই সম্পর্কেরই নির্যাস হলেন প্রেমধর্মের উদগাতা শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম রাগভক্তি বা প্রেমভক্তির ধারা নামে অভিহিত, যা বিধিভক্তিকে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা না করে আত্ম-প্রাধান্য স্থাপন করেছে। এই আত্ম-প্রাধান্য স্থাপন করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে বিশেষভাবে তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের সাথে বাংলা নাটকের সেতুবন্ধন রচিত হয়। বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে কীর্তন এবং নাট্যানুষ্ঠানকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করা হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সানুগ্রহে বিভিন্ন তিথিতে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠিত এ সব নাটকের তিনি শুধু ব্যবস্থাপকই ছিলেন না, ছিলেন একাধারে নাট্যাভিনেতা ও নাটক রচনায় অন্যতম উৎসাহদাতা। মূলত চৈতন্যদেব তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে গণতন্ত্রায়ন করেছিলেন, অর্থাৎ সব ধর্ম-বর্ণ-মতের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই সমন্বয়ে গণসংযোগ ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মিলন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল কীর্তন ও নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ উপর্যুক্ত মন্তব্যের

প্রমাণ বহন করে চলেছে। নৃত্য-গীত-বাদ্যের নাট্যক্রিয়া বৈষ্ণব ধর্মে স্বীকৃত। স্বীকৃতির কারণ অনেকটাই বিস্ময়ের! বিস্ময়ের কারণ – নতুন কোনো মতবাদ বা দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কীর্তন ও নাট্যানুষ্ঠানে ব্যাপক গণসংযোগ ঘটানো যায়, প্রভাবিত করা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় শ্রীচৈতন্যদেবের আর এক অভিনব সংযোজন ছিল 'সংকীর্তন' বিশেষ করে 'নগর সংকীর্তন'; যা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থপাঠে জানা যায় – নবদ্বীপ ও নীলাচলে চৈতন্যপর্ষদের মধ্যে অনেকেই নাট্যরচনা, অভিনয়, নির্দেশনা ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বহু নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাতে অভিনয় করেছেন। তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াস চৈতন্যোত্তরকালে নাট্যধারায় ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণ হিসেবে আমরা 'যাত্রা'র কথা বলতে পারি। চৈতন্য-পূর্ব সময়ে আমরা একবার ফিরে তাকালে বিষয়টির এক ক্রমবিবর্তন ধারা সুস্পষ্ট হয়। যেমন : *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। অনেকে কাব্যটিকে অমার্জিত রচনা বললেও তার মধ্যে নাট্যগুণের অভাব নেই। অবিচ্ছিন্ন কাহিনিধারায় নাটকীয়তায় ভরপুর কাব্যখানি যে, 'গীতিনাট্যরূপে অভিনীত হতো, তার প্রমাণ গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্ট'। (অজিত, ২০১৬ : ২০) ড. সুকুমার সেনের মত অনুযায়ী বলা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে গীতনৃত্য-নাট্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি হলো – সঙ্গীতনাটক, চিত্রগীত, অঙ্কীয় অর্থাৎ স্বাঙ্গ অভিনয় বা পাত্রনৃত্য। (সুকুমার, ২০০৪) *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নাটকের ক্ষেত্রে আঠারো প্রকারের উপরূপক আলোচনাকালে গীতিনাট্য প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছিলেন। এই গীতিনাট্যের ধারাবাহিকতাই দেখা যায় *চর্যাপদ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* গীতিনাট্যরূপেই পদ ও কাহিনি উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলি লৌকিক গীতিনাট্যের মধ্যে পড়লেও তাতে নাট্যগুণের কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবও সপার্ষদ যে নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার অভিনয় ছিল গীতিনাট্যময়। অর্থাৎ, তিনি যে ধারা অনুসরণ করেছিলেন তা সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশের ধারার সাথে কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য যুক্ত হলেও কলাকৌশল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা ছিল অনেকাংশে স্বতন্ত্র। তাঁর পরিণত বয়সের নাট্যক্রিয়ায় দেখা যায়, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ও নতুনতর বিষয় সংযোজিত হতে। চৈতন্যদেবের এই মানসভূমি প্রস্তুত হয়েছিল বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রায় রামানন্দ প্রমুখ লেখকের লেখা কাব্য, পদাবলি, নাটক ইত্যাদির নিরন্তর পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। যথা:

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ (কৃষ্ণদাস, ১৯৭৯ : ১৫৬)

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থে যে নাট্যক্রিয়ার পরিচয় বিধৃত রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় রসের আস্বাদন হলেও বাহ্যিকভাবে নাট্য-বিনোদনের যথেষ্ট কাঠামো পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে নাট্য-উপাদান অনুসন্ধানের পথকে সহজতর করার লক্ষ্যে আমরা 'নবদ্বীপ পর্ব' এবং 'নীলাচল পর্ব' – দুটি শিরোনামে বিভক্ত করে মূল আলোচনায় ব্রতী হবো। আমরা শ্রীচৈতন্যজীবনী, যথাক্রমে বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* এবং জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* এবং অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থকে অবলম্বন করে আলোচনায় অগ্রসর হবো।

গ. নবদ্বীপ পর্ব

মধ্যযুগের নাট্য-ইতিহাসে বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত গ্রন্থ। কারণ, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন এবং আমরা অনুমান করতে পারি, এ বর্ণনাটি বাংলা নাট্যরীতিতে অভিনয়ের প্রথম লিখিত প্রমাণ। নবদ্বীপ পর্বে পরম বৈষ্ণব চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে সঙ্গীজনকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য 'ব্রজলীলা' ও 'রুক্মিণীহরণ' বিষয়ে দুটি অঙ্কে নাট্যাভিনয় করেছিলেন। সম্ভবত জীবনীকার বৃন্দাবন দাস কি 'অঙ্ক' বলতে 'প্রহর' বুঝিয়েছেন। কারণ এই 'প্রহর' দ্বারা মূলত নাট্যরীতির শব্দ 'অঙ্ক' বুঝায়। নাট্যবিষয়ে চণ্ডীদাসের (বড়ু চণ্ডীদাস) 'রাধাবিরহ' অংশটির প্রভাব অধিক মাত্রায় ছিল। ড. সুকুমার সেনও এমনটি মনে করেছেন। (সুকুমার, ১৯৮৪ : ৬১) আমরা মনে করি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই শ্রীচৈতন্য এই নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। যথা :

> একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
> আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৬৯)

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব নাট্যসংগঠনের পূর্বে শুধুমাত্র কীর্তন ও ভাবালোচনার মধ্যেই স্থিত ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি গণসংযোগকে আরও প্রায়োগিক ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইলেন; বেছে নিলেন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পৌরাণিক 'রুক্মিণীহরণ' পালা এবং ভাবালুতাময় 'ব্রজলীলা'। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, 'রুক্মিণীহরণ' বিষয়ের সাথে 'ব্রজলীলার' তাত্ত্বিক অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাহলে এই দুটি বিষয়কে শ্রীচৈতন্য এক সাথে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? এ বিষয়ে আমাদের ধারণা দুটি। প্রথমত পৌরাণিক আখ্যান 'রুক্মিণীহরণ' *ভাগবত* ও *মহাভারতের* একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ও লোকভাষ্যেও তার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বা লোক পরম্পরায় তা চলে আসছে। সুতরাং লোকনন্দিত এই বিষয়টিকে বিতর্ক এড়াতেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মে ব্রজলীলাই সারবস্তু। সুতরাং প্রেমধর্ম প্রচার বা প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রজের নির্মল প্রেমরসসুধার প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুকে তিনি উপস্থাপন করলেন উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে। এই দুইটি বিষয়ের সমন্বিতরূপই নবদ্বীপে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম

প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল বলে আমরা মনে করি। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বৃন্দাবন দাস *চৈতন্যভাগবতের* মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে শ্রীচৈতন্য 'কাচ সজ্জা' করতে বললেন। তিনি তাঁকে অভিনয়-স্থান নির্মাণ, পোশাকসজ্জা ও রূপসজ্জার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। চৈতন্য-নির্দেশে বুদ্ধিমন্ত খান শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ি, অলঙ্কার সংগ্রহ করলেন। এই নাটকের নির্দেশক বা অধিকারী হলেন চৈতন্য-স্বয়ং। তিনি নাটকের চরিত্র বণ্টন করলেন এভাবে –

ক. গদাধর পণ্ডিত	–	রুক্মিণী চরিত্র
খ. ব্রহ্মানন্দ	–	সখী সুপ্রভাত
গ. নিত্যানন্দ	–	যোগমায়ারূপী বড়াই
ঘ. হরিদাস	–	কোতোয়াল বা কাটোয়াল
ঙ. শ্রীবাস	–	নারদ
চ. শ্রীরাম (শ্রীবাস ভ্রাতা)	–	নারদ-সহযোগী
ছ. শ্রীমান (শ্রীবাস ভ্রাতা)	–	দিয়ড়িয়া বা দেউরিয়া বা দীপধারী।

শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে করিব পাত্র-কাচ' (প্রধান চরিত্র)? (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৬৯) চৈতন্যদেব প্রধান চরিত্র নির্ধারণ করে দিলেন। সিংহাসনে বসা 'গোপীনাথ বিগ্রহ' হবে নায়ক। অর্থাৎ তাঁকে কেন্দ্র করেই নাট্যক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীঅদ্বৈত কোন নির্ধারিত চরিত্রে থাকলেন না। তিনি সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্র-অনুযায়ী বিদূষকের ভূমিকায় থাকলেন। শ্রীচৈতন্য হলেন :

> প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইবে আমার।
> দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় – তার অধিকার। ...
> লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
> সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৬৯)

অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি-স্বরূপ (স্বরূপা) লক্ষ্মীর বেশ নিলেন। এই লক্ষ্মীরই মানবরূপ শ্রীরাধা। তবে নাটকের শুরুতে শ্রীচৈতন্য এক ধরনের শঙ্কা প্রকাশ করলেন, তাহলো – অভিনেতাগণ ইন্দ্রিয়শক্তি ধরে রাখতে পারবেন কিনা। পরবর্তীকালে দেখা যায় অনেকেই, যেমন : নিত্যানন্দ, শচীদেবী, চৈতন্য-স্বয়ং প্রমুখ আবেশে মূর্ছা গিয়েছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে সংগৃহীত উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। সবাই নির্দেশিত চরিত্রানুযায়ী সজ্জিত হলেন। বৈষ্ণবগণের পরিবার

এসে নাট্যস্থলিতে এসে মিলিত হলো। মহা-বিদূষক শ্রীঅদ্বৈত নাট্যানুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। শুভারম্ভ হলো কীর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদকবি কীর্তনীয়া মুকুন্দ দাস, রামকৃষ্ণ, নরহরি, গোপাল ও গোবিন্দের কীর্তনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলো। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির প্রাঙ্গণে নাট্যপোযোগী মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। কীর্তনের মাধ্যমে নাটকের শুভারম্ভ হলে, মঞ্চে প্রথম প্রবেশ করেন হরিদাস। রূপসজ্জাকারী বুদ্ধিমন্ত খান প্রত্যেকের রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। হরিদাসের মাথায় ছিল পাগড়ি, পরনে ধটী বা মালকোচা দেওয়া ধুতি এবং মুখে বড় গোঁফ লাগানো; লাঠি হাতে প্রথমে মঞ্চে আসলেন। তিনি গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো তাঁর আগমনের কারণ এবং ঘটনার ব্যাখ্যা করলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে এবং তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন করলেন মুরারী গুপ্তের সাথে। তারপর আসলেন শ্রীবাস, নারদরূপে। বীণা কাঁধে, কুশ হাতে কমন্ডলু নিয়ে উল্লাস করতে করতে মঞ্চমাঝে এসে উপস্থিত হলেন। নারদ-সহযোগী শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁকে বসতে দিলেন। দর্শকের মনে emotion-এর purgation হলো। শ্রীবাস পণ্ডিতকে উপস্থিত সবাই নারদ-জ্ঞান করতে লাগল। বলাবাহুল্য, শ্রীবাসের অভিনয় এতটাই নিখুঁত হয়েছিল যে, শচীমাতাসহ প্রায় সবাই তাঁকে চিনতে ভুল করেছিল। এদিকে গৃহাভ্যন্তরে বেশধারী শ্রীচৈতন্যের রুক্মিণী ভাবের জাগরণ ঘটলো। আপন মনে বিদর্ভের সুতার মতো আপন হৃদয়-মন্দিরে নয়নের জলে পত্র লিখতে শুরু করলেন। পৃথিবীই যেন পত্র আর আঙ্গুল যেন কলম। রুক্মিণী আবেশে শ্রীচৈতন্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* ১০|৫২|৩৭ সংখ্যক শ্লোক আওড়াতে থাকেন। জরাসন্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণকে যে আবেগময় চিঠি রুক্মিণী লিখেছিলেন, চরিত্রচিত্রণে শ্রীচৈতন্য পৌরাণিক আখ্যানের কল্পনায় নিজেকে প্রকাশ করলেন। আমরা মনে করি, গৃহান্তরে চৈতন্যের যে নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হলো তা আধুনিক নাটকের পরিভাষায় 'একক নাটক' বলা যায়। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর যে আত্মচৈতন্য তিরোহিত হওয়া বা ভাবাবেশ ঘটা তা নাটকের একটি তাৎপর্যপূর্ণ তাত্ত্বিক পদ্ধতি। যার যথাযথ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একজন দক্ষ অভিনেতা চরিত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে দর্শক মনেও এক তীব্র ভাবাবেগের জন্ম দেয়। নাট্যরীতিতে এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো – অভিনীত চরিত্রটির নিকটে পৌঁছে যাওয়া। এই রীতিতেই শ্রীচৈতন্য রুক্মিণী, রাধা, লক্ষ্মী প্রভৃতির চরিত্রের নিকট পৌঁছেছিলেন। নাটকের প্রথম প্রহরে বা পর্বে বা অঙ্কে বিচিত্র কৌতুক তথা আনন্দ হয়েছিল। যথা :

> এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
> সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে-হাসে ॥
> হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর মন্দিরে।
> চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে ॥ ...
> প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
> দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৭৩)

নাটকের প্রথম পর্বে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য মঞ্চে আসেননি; অন্য কুশীলবেরা চরিত্র মতো অভিনয় করেছিলেন। গৃহান্তরে চৈতন্যের রুক্মিণীর আবেশ হয়েছিল। অনেক গবেষক 'গৃহান্তর অভিনয়' নিয়ে নানান প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বিশেষ করে সুকুমার সেন, বিজিত কুমার দত্ত – তাঁরা এই রীতিকে 'অঙ্কীয়া নাট্যরীতি' বলে অভিমত দিয়েছেন। (সুকুমার, ২০০৪ : ৪১৪; বিজিত, ১৯৮০ : ৪৯;) যেহেতু অঙ্কীয়া নাট্যরীতিতে প্রবেশ-প্রস্থান নেই, সেই ঐতিহ্যতাড়িত ধারণায় তাঁরা সম্ভবত মন্তব্য করেছেন। এ-ক্ষেত্রে আমাদের মত ভিন্নতর। আমরা মনে করি, চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে সম্ভবত গোপীনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে[২] নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের ধারণা হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও বিভিন্ন *মঙ্গলকাব্য* তখন নাট্যভঙ্গিতেই উপস্থাপন করা হতো। শ্রীচৈতন্যদেব নির্দেশিত এই নাটকটিও হয়তো একটি বিশেষ রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে তা অঙ্কীয়া নাট্যরীতি কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রথম পর্বের নাট্যক্রিয়ায় মূল নাট্যকেন্দ্রে যে সব অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের সাজসজ্জা (Make-up) আগেই বুদ্ধিমন্ত খানের আনুকূল্যে সম্পন্ন হয়েছিল। চৈতন্যদেব হয়তো মূলমঞ্চে না থেকে 'গৃহান্তর' – অর্থাৎ মূলমঞ্চের বাইরে সম্মুখের গোপীনাথ মন্দিরের ভেতর ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত এই যে, নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্ভবত দেবস্থলীর সামনে। দর্শক-বৈষ্ণবগণও ছিলেন দেবস্থলীর সামনে এবং চতুর্দিকে মূল মঞ্চকে কেন্দ্র করে। সুতরাং চৈতন্যের আবেশ বা নাট্যক্রিয়া দর্শকের না দেখার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আবার এমনও হতে পারে, উপর্যুক্ত গবেষকগণ 'গৃহান্তর' বলতে যা বুঝিয়েছেন, শ্রীচৈতন্য হয়তো সেখানেই আবেশপ্রাপ্ত হন। যারা সেখানে ছিল, তারা তাঁকে দেখে ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। ফলে সমবেত সবাই ছুটে সেখানে গিয়ে এই নাট্যক্রিয়া অনুভব করেন। অথবা, শ্রীচৈতন্য নিজেই ভাবাবেগে গৃহান্তর হতে বাইরে আসলে সবাই ধ্বনি দিয়ে তা উপভোগ করেন। তবে আমরা উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে গবেষকগণ কর্তৃক চিহ্নিত 'অঙ্কীয়া নাট্যরীতি' হিসেবে এই নাটকটিকে দাঁড় করাতে পারি না।

'রুক্মিণীহরণ' পর্ব শেষ হলে ব্রজভাবে ভাবিত হয়ে 'ব্রজলীলার' নাট্যাভিনয় শুরু হয় দ্বিতীয় প্রহরে। রুক্মিণীরূপী গদাধরের সাথে সুপ্রভাত তান সখীরূপী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই পর্বের নাট্যক্রিয়ার সূচনা হয়। নাট্যের উৎকর্ষ বা Climax পর্যায়ে দেখা যায় 'রমা' বেশে গদাধর নাচছেন এবং তিনি যেন কৃষ্ণের প্রকৃতিস্বরূপা হয়ে উঠেছেন। কাথিবার চাঁদোয়া টাঙানো মঞ্চে এমন বিমোক্ষণের আবেশ ছড়িয়ে পড়ল যে, অভিনেতা-দর্শক এক হয়ে গেলেন। যেমন :

> যে গায়, যে দেখে – সব ভাসিলেন প্রেমে।
>
> চৈতন্য-প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৭৩)

নাট্যমঞ্চের এমন পরিবেশ তৈরি হলো যে, কৃষ্ণপ্রেমে সবাই কাঁদতে লাগলো। এমন সময়ে আদ্যাশক্তির বেশ ধরে শ্রীচৈতন্য মঞ্চে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে প্রেমরসে

ভেসে বড়াইরূপী নিত্যানন্দ আসলেন। চৈতন্যের অভিনয়-কৌশলে দর্শক মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হলো। তাঁর অপূর্ব বেশে সবাই এক অপার্থিব শিহরণ অনুভব করলো। বৃন্দাবন দাস এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা ॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী ॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ॥ ...
আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৭৪-২৭৫)

শ্রীচৈতন্যে এমনই নাটকীয়তা উপস্থাপন করলেন যে সমবেতজন মনে করলেন, ‘মূর্ত্তিভেদে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে’। (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৭৪) অচিন্ত্য অব্যক্ত সত্য যেন ভক্তির অন্যতম পরাকাষ্ঠায় প্রদর্শিত হতে লাগলো। জগজ্জননী মহামায়া আবেশে চৈতন্য যেন সকলকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। অঘটনঘটনপটিয়সী যোগমায়ারূপী বড়াইয়ের (নিত্যানন্দ) হাত ধরে নৃত্য প্রদর্শিত হতে থাকে। নাট্যক্রিয়ায় অভিনেতাদের আবেশ এমনই পর্যায়ে পৌঁছালো যে, তাঁরা নির্ধারিত চরিত্রে থাকতে পারলেন না। বৃন্দাবন দাস সচেতনভাবে ঘটনার বর্ণনায় চৈতন্য তথা অন্যান্য অভিনেতাদের নাট্যক্রিয়ায় Flash back পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। বিশেষ করে চৈতন্যের অভিনয়ে উপর্যুক্ত পদ্ধতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, আবার আবেশ তিরোহিত হলে স্বীয় ব্যক্তিত্বে ফিরে এসেছেন; যা সত্যিই বিস্ময়কর। চৈতন্যের অভিনয় এতটাই নিখুঁত হয়েছিল যে, স্বয়ং শচীমাতাও তাঁকে চিনতে পারেননি। এই নাট্যাভিনয়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্য খুব কৌশলে সাধনার কামনাময় যে পরিধি–বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত ও মধুর রসকেও উপস্থাপন করালেন শচীদেবী, শ্রীগদাধর, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসের মধ্য দিয়ে। নাট্যক্রিয়ার এ পর্যায়ে বৃন্দাবন দাস ব্রজলীলাকে কৌশলে ও পরম ভক্তিতে উপস্থাপন করেছেন। প্রেমধর্মের সে পানস্বরূপ ব্রজপ্রেমের নির্মল রসকে নাট্যায়তনিক বিষয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন : নিত্যানন্দ বড়াইরূপে চৈতন্য-সহচর হয়ে মঞ্চ ভ্রমণ করছেন, আবার ভক্ত-জ্ঞানীরূপেও স্বীয় প্রজ্ঞা প্রদর্শন করছেন। চৈতন্যও অনুরূপ। কখনো মহানারায়ণীরূপে আবার কখনো অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্যের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছাপূরণ করছেন; যা ছিল তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনার সুচিন্তিত রূপপ্রকাশ।

আলোচ্য নাটকের অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে – এর প্রধান চরিত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই নাটকের প্রধান চরিত্র সিংহাসনে আসীন ‘গোপীনাথ বিগ্রহ’। প্রধান চরিত্র

সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস খুব বেশি বর্ণনা দেননি। শ্রীচৈতন্য আবেশ অবস্থায় (মহালক্ষ্মীভাবে) সিংহাসনের ওপর উঠে গোপীনাথকে কোলে তুলে নেন এবং তিনি নিজেকে কৃষ্ণজ্ঞানে উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় গোপীনাথ নামেও একজন অভিনেতার নাম উল্লেখ করতে দেখা যায় কিন্তু তার অভিনয়ের কোনো বর্ণনা তিনি দেননি। কোনো কোনো গবেষক এই গোপীনাথকেই প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই গোপীনাথই যদি নাটকের প্রধান চরিত্র হবেন তবে জীবনীকার এ প্রসঙ্গে কোন বর্ণনা দিলেন না কেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত – মঙ্গলকাব্যরীতি বা পৌরাণিক আখ্যান-বর্ণনারীতির অনুকরণে আলোচিত এই নাটকের অভিনয়ে 'সিংহাসনে বসা গোপীনাথ' বিগ্রহই প্রধান চরিত্র ছিল। শ্রীচৈতন্য আবেশাবস্থায় গোপীনাথ বিগ্রহ কোলে নিয়ে নিজেকে কৃষ্ণরূপে ঘোষণা করেন। সুতরাং গবেষকগণের উপস্থাপিত ব্যক্তি গোপীনাথ প্রধান চরিত্র হলে চৈতন্যদেবের আর নিজেকে কৃষ্ণরূপে ঘোষণা করার আবশ্যকতা থাকে না।

কোনো কোনো বৈষ্ণব ধর্মালোচক *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের* মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায় আলোচনাকালে চৈতন্যের উপর্যুক্ত নাট্যাভিনয়ে আদ্যাশক্তি, মহামায়া, চণ্ডী ইত্যাদি শাক্ত মতাদর্শের প্রসঙ্গ বৃন্দাবন দাস বারংবার তুলে ধরেছেন – এ প্রসঙ্গে এক ধরনের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আবার তাত্ত্বিক আলোচকবৃন্দের কেউ কেউ প্রেমধর্মের সাথে শাক্ত মতাদর্শের সমন্বয় করাকে সাংঘর্ষিক হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি ও বাহ্যাচার প্রসঙ্গে স্বচ্ছ ধারণা নিলে সংশয়ের কোনো কারণ থাকে বলে আমরা মনে করি না। চৈতন্যার্বিভাবের পূর্ব থেকেই বৃহৎ বাংলায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নানান মতাদর্শ, যেমন : সৌরীয়, গাণপত্য, শাক্ত ইত্যাদি মতে বিভক্ত ছিল। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মতাদর্শগত বিরোধ ছিল তুঙ্গে। সুতরাং, আমরা মনে করি চৈতন্য এই বিরোধের উপসংহার টানতেই হয়তোবা নাট্যাভিনয়ে ব্যাপকভাবে আদ্যাশক্তিরূপী মহামায়ার চণ্ডীস্তুতি করলেন। ড. বিজিত কুমার দত্ত তাঁর *চৈতন্য জীবনকথা* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জননীবেশে বিশ্বম্ভরকে চণ্ডীস্তুতি পর্যন্ত করতে হয়েছে। সেকালে, শাক্ত, বৈষ্ণব বিরোধ ছিল। এই বিরোধের মূল উৎপাটন করতে চাইছিলেন বৈষ্ণব মণ্ডলী'। (বিজিত, ১৯৮৬ : ৬৯) বলা যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। আমরা মনে করি, শ্রীচৈতন্যের এই নাট্যক্রিয়ায় ছিল Play with in aply অর্থাৎ নাটকের মধ্যে এক অদ্ভুত নাট্যক্রিয়া। যার উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক সমন্বয়সাধন এবং নবতর সংযোজন প্রেমধর্মের প্রচার।

উপর্যুক্ত নাট্যক্রিয়ার উল্লেখ কবিকর্ণপুর তাঁর বিখ্যাত রূপকাশ্রয়ী নাটক *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে* করেছেন। নাট্যগ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কে 'দানলীলা' বিষয়ক নাট্য-অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরও বৃন্দাবন দাসের মতো চরিত্র বণ্টন থেকে চরিত্রাভিনয় পর্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে–নাট্যকার

কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যকে অভিনবভাবে 'রাধা' চরিত্রে রূপায়ণ করার কথা বলেছেন। নাটকীয় শিল্পকৌশলের প্রাণবন্ত বর্ণনায় অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে চৈতন্যের নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গ। ঘটনার পরম্পরাগত সাদৃশ্য থাকলেও চরিত্র-বণ্টন, অভিনয়ের ধারা প্রভৃতি বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার সাথে অনেকাংশে অমিল পরিলক্ষিত হয়। নাট্যরীতির প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা-ও বৃন্দাবন দাস থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন : বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-অভিনীত নাটককে অঙ্করীতির নাটক হিসেবে উল্লেখ করলেও কর্ণপুর তা উল্লেখ করেছেন 'ভাণ' বা 'ব্যায়োগ' রীতির নাটক হিসেবে। এতে গবেষকদের মধ্যে এক প্রকারের ধন্ধ লেগে যায়। এর কারণ যে শুধু অভিনয়রীতি তা নয়; বর্ণনা-কৌশল, চরিত্র-বণ্টন, প্রেক্ষাপট-উপস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহও পোষণ করেছেন। যেমন : বৃন্দাবন দাস উল্লেখিত আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়িতে যে নাট্যাভিনয় হয়েছিল তাতে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দের চরিত্র ছাড়া কর্ণপুর অন্যান্য চরিত্র বণ্টনের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণিত চরিত্র বণ্টনে দেখা যায় – কৃষ্ণ চরিত্রে শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস – সূত্রধর, শ্রীচৈতন্য – রাধা, শুক্লাম্বর – নারদ সহযোগী প্রভৃতিভাবে বিন্যস্ত হতে। সরাসরি 'রাধা' চরিত্রটি বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় না এবং 'কৃষ্ণ' চরিত্রও এ ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন। শ্রীঅদ্বৈত বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় বিদূষক হলেও এখানে এসে দেখা যায় কৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে। এতে গবেষকবৃন্দের মনে এক বিচিত্র কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। তা হলো – যদি উভয় বর্ণনায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিই হয়ে থাকে, তবে এত অমিল কেন? (অসিত ১৯৯৯ : ৪১৮) শুধু চরিত্র নয় 'রস' উপস্থাপনেও দুই বর্ণনাকারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত : চৈতন্যদেবের বাল্যকাল থেকেই নাট্যভুবনের সাথে সংযুক্ত হতে দেখা যায়। তাঁর বাল্যবেলায় চিত্তবিনোদনের জন্য নানাবিধ নাট্যধারার প্রচলন নবদ্বীপে ছিল। মঙ্গলকাব্যধারার কাহিনিগুলির উপস্থাপন যে প্রায়শই হতো তা বৃন্দাবন দাসের বিবরণ থেকে জানা যায়। চৈতন্য বাল্যবেলায় নানাবিধ বিষয় (শিবগীত, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা) অবলোকন করেছিলেন এবং পরিণত বয়সে তাঁর প্রভাবে বিচিত্র বিষয়ভাবের বিভিন্ন নাট্যক্রিয়া অনুষ্ঠান করেছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে সে দিনের নাট্যক্রিয়ার যে বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন, হয়ত এই নাট্যাভিনয় মাঝে মাঝেই অনুষ্ঠিত হতো। কবিকর্ণপুর চৈতন্যের যে নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, হতে পারে সেটি অন্য আর একদিনের। এই মন্তব্যের কারণ, নীলাচলপর্বে আমরা শ্রীচৈতন্যকে নানাবিধরূপে প্রায়শই নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেখি। নবদ্বীপপর্বেও হয়তো ঐ একই ভাবের রূপায়ণ হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে উপর্যুক্ত নাটক প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। নাট্য-উপাদান অনুসন্ধানে তাঁর বর্ণনায় উপর্যুক্ত

নাটকের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না, শুধু মূল তথ্যটুকু ছাড়া। এর কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে যে যে বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন সেই বিষয়ের তিনি বিস্তৃত বিবরণ দেননি। তবে চৈতন্য-আবেশের নানান পর্যায়ের (যাকে আমরা মনে করি 'একাঙ্ক নাটক') আঙ্গিকের তথ্য-সূত্রের সন্ধান পাই। এগুলি ছিল তার Improvization প্রক্রিয়ার অংশ এবং তাঁর সংগঠিত নাট্যক্রিয়ায় ছিল Physical Acting এবং পরিশীলিত শিল্পকৌশল। গণসংযোগ ও গণ-আকর্ষণ করা ছিল তাঁর মুখ্য প্রয়াস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত বিবরণে চৈতন্য-অভিনীত বা আবেশতাড়িত ক্রিয়ায় আঙ্গিকের নানাবিধ রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। যেমন :

১. একদিন শ্রীচৈতন্য শ্রীবাসকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন 'বৃহৎ-সহস্রনাম' পড়ে শোনাতে। পড়তে পড়তে যখন স্তবের মধ্যে নৃসিংহদেবের নাম আসলো, অমনি চৈতন্যের মধ্যে নৃসিংহের আবেশ ঘটলো এবং ঐ আবেশে তিনি গদা হাতে নবদ্বীপের রাস্তায় বের হলেন। তাঁর মহাতেজোময় এই আবেশ-তাড়িত বা অভিনীত রূপ দেখে উপস্থিত দর্শক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এক অর্থে এটি ছিল সার্থক 'একাঙ্ক নাটক'।

২. জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে একদিন চৈতন্য পরিকল্পিতভাবে 'একাঙ্ক নাটক' পরিবেশন করেন। এক শিবভক্ত শিবের গুণগান ডম্বরু বাজিয়ে গাইছিলেন মিশ্রের উঠানে। শিবরূপে চৈতন্য সেদিন শিবের নৃত্য-অভিনয় করেছিলেন; যা বাড়ির সকলকে পরম প্রশান্তি দিয়েছিল।

৩. একই রীতিতে চৈতন্যদেব ভিক্ষুক, জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ ইত্যাদি চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আদিখণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে এ সব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করেছিলেন। তবে বিস্তারিতভাবে 'কাজি উদ্ধার' পর্বের অবতারণা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে নানাবিধ নাট্য-উপাদান পরিলক্ষিত হয়। Procession play বা শোভাযাত্রা নাট্যরীতিতে উক্ত ঘটনাবলিকে দাঁড় করানো যায়। জীবনীগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'কাজী উদ্ধার' পর্বটির মধ্যে নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনের বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথমত, বিষয়টি ছিল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাথে শাসকগোষ্ঠীর তীব্র মতবিরোধ। দ্বিতীয়ত ছিল, সঙ্ঘবদ্ধ বা Social Integration, অর্থাৎ সামাজিক সমীকরণকে একত্র করবার প্রয়াস। তৃতীয়ত, আমরা মনে করি শ্রীচৈতন্য উল্লিখিত ঘটনার মধ্যদিয়ে Freudian psychology বা নতুন মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যে ডুরখাইন (Durkheim) বা টোটেমগত (totemic) সঙ্ঘবদ্ধতার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যদেব তাতে পরিবর্তন আনলেন। অর্থাৎ তাঁর হয়তো বা উদ্দেশ্য ছিল সমাজে জনপদগত সমষ্টি (territorial Communes) ব্যবস্থা প্রচলনের। এই প্রয়াসের মধ্যে সুস্পষ্ট বাঙালিয়ানা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তারই এক অনন্য প্রয়াস – নাট্য-

উপাদানে ভরপুর শোভাযাত্রাময় সঙ্কীর্তন, যা গণ-আন্দোলনের এক অভিন্ন স্মারক। গবেষক বিপিনচন্দ্রের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> This general Vaishnava upheaval created a continental mass movement in India … The movement of Sri Chaitanya helped also very largely to emancipate the so-called lower classes or Castes of Bengali Hindus from many social evils under which they ihad been living in the old Brahmanical society… All these had a tremendous influence in working the uplift of the Bengali masses. (Bepinchandra, 1987 : 119-120)

বাংলার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নব-আন্দোলন গোটা ভারতজুড়ে ধর্ম ও সামাজিক জীবনে নতুন স্পন্দন দৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন তুর্কি আগমনের পর হতেই অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই সর্বত্র বিকাশ লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে রামানন্দ (শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত) উত্তর-ভারতে এই নব আন্দোলনের সূচনা করেন। দেখা যায়, এই সময়োপযোগী আন্দোলনই ভারতীয় সমাজকে সংস্কারাভিমুখী করে তোলে এবং নতুন নতুন সংগঠন-কর্ম বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। এই আন্দোলন বৃহৎ ভারতের ইতিহাসে 'সন্ত-আন্দোলন' নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেবের 'কাজি উদ্ধার' যাকে আমরা 'শোভাযাত্রা নাট্যক্রিয়া' নামে অভিহিত করেছি – তা ছিল উপযুক্ত আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা।

বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচন দাস, কবিকর্ণপুর প্রমুখ চৈতন্যজীবনীকার 'কাজি উদ্ধার' বা 'দমন' পর্বকে বেশ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। এই পর্ব থেকে বাংলার বৈষ্ণব সমাজে 'নগর সঙ্কীর্তন' ধারার সূত্রপাত ঘটে। নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উপর্যুক্ত ধারা বা রীতিতে রয়েছে অজস্র নাট্য-উপাদান। ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করলে দেখা যায়, মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিচিত্র টানাপড়েন। এই টানাপড়েনের উপলক্ষ্য ছিল বিচিত্রাভিমুখী এবং তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। মঙ্গলকাব্যসমূহে তার অজস্র বর্ণনা পাওয়া যায়। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত কাজি বা চাঁদ কাজির নির্মম অত্যাচারের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মুসলমান হরিদাস বৈষ্ণবীর প্রেমধর্মে আস্থা স্থাপন করলে শাসকগোষ্ঠী মাত্রাতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হন এবং হরিদাস তথা অন্যান্য বৈষ্ণবদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে। গয়াধামে পিতৃতর্পণ শেষে চৈতন্য নবদ্বীপে ফিরলে বৈষ্ণবরা তাঁকে কেন্দ্র করে একত্র হয় এবং সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিকার প্রত্যাশা করে। চৈতন্য-নির্দেশে তাঁরা ঊষারম্ভে প্রভাত-কীর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চাঁদ কাজিসহ অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ এতে চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তারা পরিকল্পিতভাবেই

হরিনাম সঙ্কীর্তনে বাধা প্রদান করতে থাকে, এমনকি তাঁদের বাদ্যযন্ত্রও ভেঙে ফেলতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও এক ধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় এবং তিনি সমগ্র নবদ্বীপে আরও বৃহৎ পরিসরে শোভাযাত্রাসহ নগর সঙ্কীর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অসংখ্য নর-নারী নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ সহযোগে তা সংঘঠিত করেন। অনুমেয় হয়, এই প্রথম নবদ্বীপের সমগ্র বৈষ্ণব তথা অন্যান্য মতাদর্শের জনগণ একত্র হন এবং প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। গণজাগরণেরও এই প্রদর্শন খুব সম্ভবত বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রথম ঘটনা। বৃন্দাবন দাস ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

দৈবে একদিন কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥ ...
কাজি বোলে ধর ধর আজি করো কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য ॥ ...
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ ...
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুকে কাজি সব মারে কদর্থিয়া ॥ ...
কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্তিধর ॥ ...
সর্ব-নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখোঁ মোরে কোন কর্ম করে কোন জন ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ৩০৯-৩১০)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস উপর্যুক্ত ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন বলে তিনি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মূল আবহ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন :

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ...
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ...
নগরে নগরে আজি কবির কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডণ ॥ ...
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন কাজী আসি মোর মানা করে ॥ (কৃষ্ণদাস, ১৯৭৯ : ১২৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুমিত হয়, সমগ্র নদীয়াবাসীকে একত্র করা এবং এক বৃহৎ পরিবর্তনের আশায় শ্রীচৈতন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শাসকের বিরুদ্ধে এ এক অভিনব প্রতিবাদ-পদ্ধতি। আন্দোলনের অনন্য প্রতিবাদের প্রতীক হলো দেউটি বা মশাল। আমরা ধারণা করি, গণ-আন্দোলনে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে মশালের ব্যবহারের উদ্ভাবক চৈতন্য-স্বয়ং। উল্লিখিত শোভাযাত্রার আয়োজন ও লোকসংখ্যা ছিল :

> তা'-বড় তা'-বড় করি সঙেই বান্ধেন।
> বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥
> অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
> দেউটির সংখ্যা করিবারে শক্তি কার ॥ (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ৩১০)

বাঙালির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরও সম্ভবত প্রথম প্রয়াস এই গণজমায়েত, যার উদ্যোক্তা শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায়, কীর্তনের দলকে তিনভাগে বা সম্প্রদায়ে চৈতন্য বিভক্ত করেছিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পেছনে শক্তি সাহস যোগাতে তিনি স্বয়ং নৃত্য করেছিলেন। 'প্রদীপ সঙ্কীর্তন' বা 'মশাল মিছিল' শ্রীচৈতন্যের এক অভিনব প্রতিবাদ-পদ্ধতি যা আজও মানুষ স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যবহার করে থাকেন। 'প্রদীপ সঙ্কীর্তন' শুধুমাত্র প্রতিবাদ-পদ্ধতিই নয়, এক অভিনব নাট্যপদ্ধতিও বটে। যার একক নেতৃত্বে ছিলেন চৈতন্যদেব। এই অভিনব কার্য-সম্পাদনে সমগ্র নদীয়া নতুনভাবে সেজে ওঠে। প্রত্যেকের বাড়িতেও দেখা যায় ধান, দূর্বা, কলাগাছ, পূর্ণঘট, প্রদীপ প্রভৃতি উপচারে সজ্জিত হতে। আমাদের ধারণা, আধুনিককালে গণনাট্য বা গণনাট্য সম্প্রদায়ের যেসব নাটক উপস্থাপন কৌশল তা মনে হয় চৈতন্য-প্রবর্তিত নাট্যরীতির প্রভাবপুষ্ট এবং উপর্যুক্ত দৃশ্যসজ্জা ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অনন্য উদাহরণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আধুনিক কমিউনিটি থিয়েটারের প্রসঙ্গ। যার সাথে জড়িয়ে থাকে মানবিক অবস্থার উন্নয়ন, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়; এবং তাকেই বলা যেতে পারে সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত উপর্যুক্ত রীতিকে আমরা উৎকৃষ্ট কমিউনিটি থিয়েটার বললে বোধ হয় খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না। কারণ :

> Community Theater is people's participation; local culture flavours and contents that largely analyse local issues have made these true community plays. The ultimate goal of the community theatre is not the performance, but the process of devising the play indialogical way, participation is actually the key element. Entire Community takes initiatives, asserting themselves, contributing their share to the analysis. (Jacob Srampical, 1994 : 165)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে আধুনিক কমিউনিটি থিয়েটারের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাতে শ্রীচৈতন্যদেব-নির্দেশিত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত যে শোভাযাত্রা, তার মধ্যেও আধুনিক

নাট্যধারার গুণাগুণ; ক্ষেত্রবিশেষে আরও অধিক কিছুও আমরা দেখতে পাই। পিটার ব্রুক বহমান সকল ধারণা ও ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন থিয়েটার ভাবনা এনে *মহাভারত* মঞ্চায়নের মাধ্যমে জগৎবাসীকে দিয়েছিলেন এক অনন্য আস্বাদন এবং উপর্যুক্ত নাটকের অন্যতম পাণ্ডুলিপি রচয়িতা-প্রযোজক জঁ ক্লদ করিয়ের এতে অভাবনীয় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন ৭ই জুলাই ১৯৮৫-এর Festival Avignon-এ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে – এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে বিশাল ব্যাপ্তিতে এক বিচিত্র কর্মযজ্ঞ ও নতুন দিক-নির্দেশনা। (David William, 1991 : 58) বাংলা নাট্যধারাতেও এই দৃশ্য বা ঘটনা দুর্লক্ষ্যণীয় নয়। উন্মুক্ত ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চৈতন্যের এই বিশাল আয়োজনের মধ্যেও ছিল বিশালতা, বিচিত্রতা ও নতুন আবহ সৃষ্টির দিক-নির্দেশনা।

ভক্তজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় হরিধ্বনিযোগে সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রার সূচনা হয়। লক্ষ লক্ষ দেউটি বা মশাল জ্বলে ওঠে। গোটা নবদ্বীপ নতুনভাবে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি উপস্থাপন করতে থাকে। প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে নাট্যধারার এই রীতির প্রয়োগ পরবর্তীকালে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মকে বেগবান করেছিল।

ঘ. নীলাচল পর্ব

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* মধ্যখণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এক অভিনব শোভাযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। শোভাযাত্রার পরিধি ছিল ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিতভাবে তা উপস্থাপিত হয়েছিল। জগন্নাথদেবের রথাগ্রে চৈতন্যের নৃত্য-কীর্তন, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধাভাবের আবেশের বিচিত্র নাট্যক্রিয়া, প্রেমাবেশে উদ্যানে বিচিত্র নাট্য-ভাবের বহিঃপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা বিচিত্র নাট্য-উপাদানে ভরপুর। এই পর্বে ঘটনার বিন্যাস, নৃত্য-গীত-বাদ্য, বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যের পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়। দেখা যায়, নবদ্বীপ পর্বের নাট্য-সংগঠন থেকেও নীলাচল পর্বে শ্রীচৈতন্য-নির্দেশিত নাট্যপরিকল্পনা-উপস্থাপনা সুপরিকল্পিত এবং অধিক তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে এবং তাঁর নাট্য-উপস্থাপনার ব্যাপ্তিও ছিল বিশাল; পরিকল্পনায়ও এনেছিলেন অভিনবত্ব। এখানে তিনি একাধারে পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশক। নীলাচলে তাঁর নাট্য-উপস্থাপনাকে এক অর্থে বিচিত্র মহৎ কর্মের মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা যায়।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে বসবাস শুরু করেন। এটিও ছিল তাঁর পরিকল্পনারই একটি অংশ। প্রথমত, বাংলার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ; দ্বিতীয়ত, পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের নিমিত্ত। 'সামাজিক সন্ন্যাসী' শ্রীচৈতন্য তাঁর মত ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। মানুষের প্রতি মমত্ববোধই শ্রীচৈতন্যের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল – সকল মতের সমন্বয় সাধন এবং মানবিক মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে বর্ণ-গোত্র, রাজা-প্রজা, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদি কোনো বিভাজন থাকবে না। মানবিক সমাজ-সৃজনের মধ্য দিয়ে

জগতের বৃহৎ কল্যাণ সাধন করা সম্ভব – এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এক অভিনব নাট্যক্রিয়ার আয়োজন করেছিলেন। আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মায়াবাদ'কে পাশ কাটাতে হয়তোবা তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মানুষকে এবং পৃথিবীকে নিতান্তই 'মায়া' ভাবা বা 'মায়ায় আবদ্ধ' ভাবা ঠিক নয়। সাম্য এবং প্রেমই সকল কারণের কারণ। নীলাচলে তাঁর নাট্যক্রিয়ায়ও আমরা দেখি, সাম্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠায় তিনি সকলকে একত্র করেছেন, জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে একটি একরৈখিক বলয় তৈরি করেছেন; যেখানে, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। 'জগন্নাথদেবের শোভাযাত্রা' নাট্যক্রিয়া তার অনন্য উদাহরণ। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বা আচরিত এই সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ তাঁদের অসামান্য সৃষ্টিধারায় শ্রীচৈতন্যের সংস্কৃতিচর্চার ধারাকে আরও সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> A revived and widespread study of Sanskrit among all Castes … has vivified and sweetened Bengal's intellectual life, no less than the spiritual and greatly broadened the basis of our Culture. (Jadunath, 1977 : 222)

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত শোভাযাত্রা নাট্যক্রিয়া প্রসঙ্গে আমাদের ধারণা – পূর্বাপর পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে বোধহয় তিনি এই সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, চৈতন্য যখন নীলাচলে বসবাস শুরু করেন তখন সেখানে 'পঞ্চশাখা' উড়িয়া বৈষ্ণবগণ সক্রিয় অবস্থানে ছিলেন।[৩] এই 'পঞ্চশাখা' শ্রীচৈতন্যকে গুরু ভাবতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় পঞ্চশাখার সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তীব্র মতবিরোধ শুরু হয় এবং ক্রমশ তা বাড়তে থাকে। ঈশ্বর দাস তাঁর *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে বুদ্ধের অবতার হিসেবে বর্ণনা করলে এই মতবিরোধ চরম মাত্রায় পৌঁছায়। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন বুদ্ধদেবকে মেনে নেননি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পুরীধাম থেকে যাজপুরে চলে যান। শ্রীচৈতন্যও তাঁদের ফিরিয়ে আনতে যাজপুরে গিয়েছিলেন – এমন বর্ণনা পাওয়া যায় দিবাকর দাস রচিত *জগন্নাথচরিতামৃত* গ্রন্থে। উপর্যুক্ত বিবরণের সূত্র ধরে আমাদের মনে এক গভীর প্রশ্নের জন্ম দেয়, তাহলো – চৈতন্যদেব কি তাহলে এ সব সমস্যার মীমাংসা করতেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে ব্যবহার করেছিলেন? যদিও এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন!

জগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্য এক মহামিলন পর্বের পরিকল্পনা করলেন। গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ থেকে ঘটনার পরম্পরা আমরা এভাবে সাজাতে পারি :

১. ‘রথযাত্রা’ উৎসবকে কেন্দ্র করে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য ‘কৃত্য-স্নান’ সম্পন্ন করে ‘পাণ্ডু-বিজয়’[৪] দেখতে একত্র হলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও সকলের সাথে জগন্নাথদেবের গমন দর্শন উপলক্ষ্যে এসে মিলিত হলেন।

২. শ্রীচৈতন্য-নির্দেশিত পথে প্রতাপরুদ্র সোনার ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করে চন্দন-জল ছিটিয়ে দিলেন এবং রথসজ্জা সম্পন্ন হলো। তিনি সমবেত জনকে মালা-চন্দনে ভূষিত করলেন। কীর্তনীয়া দল সুসজ্জিত হয়ে উঠলো। নেতৃত্বের সারিতে থাকলেন স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁদের নেতৃত্বে চব্বিশজন গায়ককে চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হলো। আটজন মার্দঙ্গিক (মৃদঙ্গ বাদক) দুইজনে বিভক্ত হয়ে চার সম্প্রদায়ে সংযুক্ত হলো। এ সবকিছুই চৈতন্যদেব স্থির করে দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস এবং বক্রেশ্বরকে নৃত্য করার নিমিত্তে আজ্ঞা দিলেন।

৩. প্রথম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে থাকলেন স্বরূপ দামোদর এবং তাঁর সুর-দোহার থাকলেন পাঁচজন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে শ্রীবাস, তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে মুকুন্দ এবং চতুর্থ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বিখ্যাত কীর্তনীয়া পদকার গোবিন্দ ঘোষ থাকলেন। এছাড়াও শান্তিপুরের আচার্যের একটি সম্প্রদায় গঠিত হলো; যার নেতৃত্বে থাকলেন অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ। এছাড়া কুলীন গ্রামের কীর্তনীয়া সমাজ এবং শ্রীখণ্ডের দল এসে আলাদা দুটি সম্প্রদায় গঠন করলো।

৪. জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়গুলিকে সাজিয়ে দিলেন। রথাগ্রে চার সম্প্রদায়; রথের দুইপাশে দুই সম্প্রদায় এবং পেছনে এক সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করলেন। সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল (চৌদ্দটি মৃদঙ্গ সহযোগে) বেজে উঠল। শ্রীচৈতন্য প্রত্যেকটি দলেরই অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। যেমন :

> আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
> এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস ॥
> সভে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়। ... (কৃষ্ণদাস, ১৯৭৯ : ২৭৩)

শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ পর্বের মতোই transformation প্রক্রিয়ায় নিজেকে নানাবিধ চারিত্রিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন। পণ্ডিত-জ্ঞানী-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-রাজা সবাই মিলিত হলেন। শ্রীচৈতন্যের যোগ্য নির্দেশনায় এক অভূতপূর্ব নাট্যক্রিয়া শুরু হলো।

৫. শ্রীচৈতন্য উদ্দণ্ড-নৃত্যের প্রয়োজনে স্বরূপসহ নয়জন নিয়ে পুনরায় একটি দল করলেন। অবশ্য এর পূর্বে তিনি সব দলকে একত্র করেছিলেন। উদ্দণ্ড-নৃত্য নাট্যক্রিয়ায় চৈতন্য ‘একক সংলাপ’ (স্তুতি) পরিবেশন করেন। এটি ছিল গীতি-নাট্যাভিনয়। যেমন :

১. দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধ মুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ...
২. উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥ ...
৩. প্রভুর নৃত্যে-প্রেম দেখি চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার ॥ ...
৪. জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগলে করে গীত-অভিনয় ॥ (কৃষ্ণদাস, ১৯৭৯ : ২৭৩-২৭৮)

শ্রীচৈতন্য নির্দেশিত 'জগন্নাথদেবের শোভাযাত্রা' নাট্যক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে – এর নাট্য আঙ্গিক। যেহেতু চৈতন্যের নাট্যাভিনয় ও নাট্য-নির্দেশনার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, তাই অত্যন্ত সফলতার সাথে এই নাট্য-গীত-অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল।

উদ্দণ্ড-নৃত্য শেষে বা নৃত্যগত পালার অভিনয় শেষ হলে শ্রীচৈতন্য স্বরূপ দামোদরকে গীত পরিবেশনের আহ্বান জানান। স্বরূপ গাইলেন –

সোইত পরাণনাথ পাইলুঁ।
ঐহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ (কৃষ্ণদাস, ১৯৭৯ : ২৭৬)

এই ধুয়াগানের সাথে চৈতন্য নৃত্য করেছিলেন জগন্নাথদেবের রথের সামনে। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ধুয়াগানের জনপ্রিয়তা বা তাকে লোকনন্দিত করাও চৈতন্যের এক বিশেষ অবদান। উত্তর যুগে দেখা যায় পদাবলি কীর্তনে এই ধুয়াগান একটি পর্বে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতাও লোকনন্দিত বিষয় হিসেবে এখনো টিকে আছে। নীলাচল পর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বিভিন্ন বিষয়ে নাট্যক্রিয়া প্রায়শই অনুষ্ঠিত হতো এবং সে সব অনুষ্ঠানের বিবরণ চৈতন্যচরিতকার দিয়েছেন। শুধু চৈতন্যদেবই নয়, তাঁর পার্ষদগণও নাট্যাভিনয়, নাট্য-রচনা ও নির্দেশনায় পারদর্শী ছিলেন। তার বহু নিদর্শন বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস প্রমুখ জীবনীকার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নাট্যক্রিয়ায় নানাবিধ Composition-এ পরিবর্তন যেমন এনেছিলেন তেমনি নতুন নতুন নাট্যভাবনাও সংযুক্ত করেছিলেন। গীত-অভিনয়ে দলীয় নৃত্য ও একক নৃত্যের সমন্বয়করণ, বিভিন্ন আবেশের মধ্যদিয়ে যথাযথ চরিত্রের বাস্তব আবহ ফুটিয়ে তোলা, লোকনাট্যে নানাবিধ বিষয়বস্তুর সংযোজন ইত্যাদি তাঁর অনন্য কীর্তি। বিশেষভাবে পরিবর্তিত প্রক্রিয়ায় নিজেকে তিনি যে ভাবে একাধিক চরিত্রে উপস্থাপন করেছিলেন তা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

নবদ্বীপ থেকে নীলাচল – চৈতন্যজীবনপ্রবাহে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব এসে মিশেছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন অভিনেতা, কেউ নাট্য-রচয়িতা, কেউ নাট্য-

নির্দেশক আবার কেউ পৃষ্ঠপোষক। নবদ্বীপে যেমন আমরা বুদ্ধিমন্ত খাঁন, চন্দ্রশেখর আচার্যকে পাই। তেমনি নীলাচলেও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাই রাজা প্রতাপরুদ্রকে। নীলাচলে চৈতন্যের নাট্যাভিনয়ে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। চৈতন্যের সময়ে রায় রামানন্দ ছিলেন বৈচিত্র্যময় নাট্য-রচয়িতা। রাজা প্রতাপরুদ্র তঁকেও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। রায় রামানন্দের *জগন্নাথবল্লভ* নাটকটির মঞ্চায়ন বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।[৫] *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে*ও এ-বিষয়ের বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ বৃন্দাবন দাসও দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতী নাম গ্রহণ করে নীলাচলে চলে আসেন। এ সময় তাঁর অন্যতম পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গী ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি চৈতন্য-আদেশে বাংলায় ফিরে এসে সংসারী হন এবং প্রেমধর্ম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব 'জন্মাষ্টমী'তে ব্রজলীলা-আবেশে নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বাংলায় ফিরে আসার পর তিনি নানাবিধ নাট্য-আয়োজন, নাট্যাভিনয় ও নাট্য-নির্দেশনা দিতে থাকেন। নবদ্বীপ যাত্রাকালে কৃষ্ণ-আবেশে তাঁকে 'গোপাল' চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। চৈতন্য-পার্ষদ গদাধরকে দেখা যায় 'শ্রীরাধা' চরিত্রে। একইভাবে তাঁর অন্যতম পার্ষদ কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিতকেও অভিনয় করতে দেখা যায়। গদাধর দাসের মন্দির প্রাঙ্গণে 'গোপাল বিগ্রহ' দর্শনে নিত্যানন্দের আবেশ জন্মায় এবং পার্ষদগণ নিয়ে তিনি দানলীলাভিনয় করেন। নিত্যানন্দের অন্যান্য নাট্য-নির্দেশনা ছিল 'কংসবধ', 'ইন্দ্রজিত বধ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি। তাঁর অভিনীত ও নির্দেশিত নাটকে দেখা যায় উপযুক্ত Costume এর ব্যবহার এবং dramatic action ও irony দিয়ে climax তৈরি করতে। (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ৪৭-৬৩) এ থেকে সহজেই অনুমেয় হয় – চৈতন্যের সময়ে নানাভাবে ও রূপে, সর্বোপরি বিভিন্ন আঙ্গিকে নাট্যক্রিয়া অনুষ্ঠিত হতো।

শ্রীচৈতন্যের আর এক অনন্য দিক সাহিত্য তথা সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ প্রদান। তিনি তাঁর সমসাময়িক পার্ষদদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ যেমন দিতেন তেমনি নাট্যরচনায়ও উদ্বুদ্ধ করতেন। জীবনীগ্রন্থসমূহে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে তাঁর নির্দেশনায় 'ষড় গোস্বামী' (শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস) বৃন্দাবনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং তারই আদেশে তাঁরা বিচিত্র পঠন-পাঠন শুরু করেন এবং বৈষ্ণবীয় গ্রন্থসমূহ লেখা শুরু হয়। তাঁদের এই লেখনী-ধারায় নাটক, অলঙ্কারগ্রন্থ, পদাবলি ইত্যাদি নবআঙ্গিকে রচিত হয়। যেমন : শ্রীরূপ গোস্বামীর নাট্যগ্রন্থ *বিদগ্ধমাধব* (সাত অঙ্ক বিশিষ্ট), *ললিতমাধব* (দশ অঙ্ক বিশিষ্ট), *দানকেলিকৌমুদী* যা *ভাণিকা* নামে খ্যাত, *নাটকচন্দ্রিকা* ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য যে শুধু নাট্য ও দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়; নর্তক, গায়ক, বাদক, গীতিকবিদের তিনি দিয়েছিলেন যথাযোগ্য পথ-নির্দেশনা। 'মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, স্বরূপ-দমোদর, রামরায়, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ তার অনন্য উদাহরণ'। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : ৭৪২)

নীলাচলপর্বে আলোচনাকালে আমরা উল্লেখ করেছি, শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যাক্রিয়ার অভিপ্রায়। সঙ্গত কারণে একথাও বলা যায় তাঁর জীবন ও কর্ম অতিবাহিত হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। যদি তাই হয় তাহলে চৈতন্যের প্রেম ও অহিংসা-ধর্ম কি সবার মনে রেখাপাত করেছিল? নাট্যময় জীবনে কি তাঁর সামন্ত সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের সাধ জেগেছিল? উপর্যুক্ত প্রশ্নের অবতারণার কারণ – বহু চৈতন্য-গবেষক চৈতন্য-জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়কে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করে নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডকে তাঁর জীবনের সাথে সরলীকরণ করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন। (Bipinchanda, 1987, 119-120) এর ফলে তাঁর নাট্যক্রিয়াসহ অন্যান্য জীবনপ্রবাহে এক ধরনের রাজনৈতিক তত্ত্ব আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত ভিন্ন। সম্রাট অশোকের পূর্ব হতেই দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন ধর্মাবলম্বীরা অহিংসবাদী ছিল এবং তাঁদের মহামানবগণ প্রেম দিয়ে শত্রু জয় করার উপদেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর পণ্ডিতেরা এটিকে দুর্বলতার পরিচায়ক হিসেবে নানাভাবে নিন্দা করেছেন। *গর্গসংহিতায়* এ বিষয়ে নানাভাবে ব্যঙ্গ করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থসমূহে দেখা যায়, 'বর্ণাশ্রমী সনাতনপন্থীরা বরাবরই অহিংসাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন'। (ভূপেন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৮৪) কিন্তু বাংলায় অহিংসাবাদের পুনঃপ্রবর্তনকারী শ্রীচৈতন্য। খ্রিষ্ট্রীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রমাণের অভাব নেই। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে সামন্ততান্ত্রিক যুগের শেষভাগে । মোঘল সাম্রাজ্যবাদ যখন বাংলায় সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে দিচ্ছে, তখনই দেখা যায় চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। প্রভাব বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্ভবত অহিংসাবাদের পুনঃপ্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমন্বয়করণ, বর্ণপ্রথাকে একটি সাধারণ মানদণ্ডে স্থাপন এবং সামন্তবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথপ্রদর্শন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম বাঙালিমানসকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমরে উদ্বুদ্ধ করেনি, এমনকি শাক্তমতের উপাস্য মন্ত্র–'যশো দেহি, দ্বিশো জহি'... ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষায়ও হৃদয়কে জাগায়নি; বরং চৈতন্য-অনুসারীদের মনে Other-Worldliness বা বাহ্যজগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভাবের অতীত ভাবকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা ছিল পরিপূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক Ideational. (Sorokin, 1976 : 595-596)।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারবত্তা নির্ণয়ে আমরা বলতে পারি, শ্রীচৈতন্যের ভাব-আন্দোলনের যে প্রগতিশীল প্রেক্ষাপট তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মানসিকতায় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে। বিশেষভাবে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তিনি যে অভিনব পদ্ধতিতে নাট্যক্রিয়া ও কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজের জাত্যভিমানের যে 'অহম' তা অনেকাংশে দূর হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সমন্বয় সাধনের বীজ চৈতন্য বাঙালি সমাজে রোপণ করেছিলেন, তাঁর

এই গণ-আন্দোলনের (Mass-Movement) স্রোত চৈতন্যোত্তর কালে স্তিমিত হয়ে যায় জাতীয় কার্যকারণের জ্ঞানের অভাবে। শ্রীচৈতন্যদেব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিতবাদের হাত থেকে হিন্দুদের উদ্ধার করার জন্য যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন বৃহৎ; তা তাঁর তিরোধানের পর এক শতাব্দীর মধ্যে ম্লান হয়ে পড়ে। এ-ও এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

নবদ্বীপ ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের যে জীবনপ্রবাহ তা প্রকৃত অর্থেই নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। জীবনীগ্রন্থসমূহে এই নাটকীয় ভাবময় জীবনের বিচিত্র বর্ণনা যেমন আছে তেমনি তাঁর অপূর্ব কর্মসম্ভার সচেতনভাবেই চরিতকারেরা উপস্থাপন করেছেন। আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি তাঁর বিচিত্র সাংস্কৃতিক উদ্যোগের বিষয়। গণজমায়েতে নাট্যক্রিয়ায় তত্ত্বপ্রচার কিংবা প্রতিবাদী চেতনায় শোভাযাত্রা নাট্যপ্রদর্শন – এ সবই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টিসম্ভার। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আমরা যাত্রার নতুনতর বিকাশলাভ করতে দেখি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বা এককভাবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ আখ্যান যাত্রার বিষয়বস্তু হিসেবে রূপ গ্রহণ করে। আর এক বিষয় তখন বাঙালি-মানসে প্লাবন সৃষ্টি করেছিল, তা হলো – চৈতন্যজীবনীকেন্দ্রিক যাত্রাভিনয়। চৈতন্যের জীবনকালেই চৈতন্যযাত্রার সূত্রপাত হয়। *চৈতন্যভাগবত*কার বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য বিজয়' কাহিনি হিসেবে তা উল্লেখও করেছেন। সুতরাং, দেখা যায় চৈতন্যজীবনগাঁথা যাত্রার নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে আজও দেখা যায় 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রাপালা যা লোকনাট্য হিসেবে জনপ্রিয় এবং বিভিন্নভাবে তা এখনও অভিনীত হচ্ছে।

চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্যদেবের অভিনীত নাটকের নাট্যরীতির বিচার আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বিষয় না হলেও নাট্য-উপাদান অনুসন্ধানে তার রূপতাত্ত্বিক কিছু প্রসঙ্গ না উত্থাপন করলেই নয়। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্* গ্রন্থসমূহে শ্রীচৈতন্য-অভিনীত নাটকের প্রকৃতি ও রীতিগত বিষয় নিয়ে গবেষক-পণ্ডিতজনেরা নানাভাবে আলোচনা করেছেন এবং ঐ নাটককে নানাবিধ নাট্যরীতির নাটক হিসেবে গণ্য করেছেন। সুকুমার সেন, বিজিতকুমার দত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বোরা প্রমুখ পণ্ডিতগণ নানাভাবে চৈতন্য-অভিনীত নাটকের রীতি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল, 'আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে' – চৈতন্যের এই উক্তিকে কেন্দ্র করে নাটকের রীতি নির্ণয়। যেমন :

১. সুকুমার সেন চৈতন্য-অভিনীত উপর্যুক্ত নাটককে (রুক্মিণীহরণ) 'অঙ্কীয়া নাট' হিসেবে গণ্য করেছেন। অসমীয়া 'অঙ্কীয় নাট' এবং সংস্কৃত 'অঙ্ক' – এ দুটি বিষয়কে তিনি একইভাবে বা একই রীতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। (সুকুমার, ১৯৮৪ : ৫৬)

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের দ্বিতীয় প্রহরে আদ্যাশক্তির আবেশে চৈতন্যের নৃত্য ও অন্যান্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে নাট্যক্রিয়া তাকে অসঙ্গতিময় একটি সাধারণ পরিবেশনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (অসিত, ১৯৯৯ : ৪১৫)

৩. অন্যান্য গবেষকবৃন্দ উপর্যুক্ত নাটককে অঙ্কীয়া নাট, অঙ্ক, ব্যায়োগ, নাটগীত, ভাণ, সংস্কৃত অঙ্ক-নির্ভর নাটক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

'অঙ্কীয়ানাট-পদ্ধতি' আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আসাম তথা বাংলার অনেক স্থানে এই নাট্য-পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। মূলত এটি একটি মিশ্র নাট্যপদ্ধতি। আচার্য শঙ্কর খুব সম্ভবত পূর্বে প্রচলিত নাট্যধারার সাথে সমন্বয় করে এই নাট্যরীতির প্রচলন করে ছিলেন। ড. সুকুমার সেন এই নাট্যরীতির সাথে পুতুল নাচ, ওঝাপালির মিশ্রিত রূপ দেখতে পেয়েছেন। **ক.** 'অঙ্কীয়া নাট' মূলত আসরকেন্দ্রিক অভিনয় পদ্ধতি। এখানে প্রবেশ-প্রস্থান নেই। এটি মূলত যাত্রার আঙ্গিকেই উপস্থাপিত হতো'। (বিজিত, ১৯৮০ : ৬৯) এই নাট্যধারার অন্য আর এক বৈশিষ্ট্য – কথকতা ও পদাবলির গানের মিশ্রিত রূপে দেখতে পাওয়া যায়। (সুকুমার, ২০০৪ : ৫৬-৫৭) 'অঙ্কীয়ানাট' এক অঙ্ক বিশিষ্ট হয়ে থাকে। **খ.** সংস্কৃত 'অঙ্ক' রূপকাশ্রয়ী নাট্যপদ্ধতি। আচার্য ভরত নাটকের দশটি (নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বিথী, প্রহসন, ডিম, ঈহামৃগ) রূপভেদের বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে 'অঙ্ক' নাট্য আলোচনাকালে এই নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। যেমন : 'অঙ্ক' নাটকের রস করুণ, বিষয়বস্তুর ধরন হবে প্রখ্যাত ঘটনা, নায়ক সাধারণ মানুষ। 'অঙ্ক' নাটক সাধারণত এক অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ঘটনার পরম্পরায় থাকবে ইতিহাসের বিখ্যাত কোন কাহিনি। **গ.** 'ভাণ' একাঙ্ক নাটক। এখানে নায়ক থাকে নিকৃষ্ট কিন্তু নায়িকা উৎকৃষ্ট; বেশবাসের সূক্ষ্মতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর সন্ধি ও বৃত্তি অনেকাংশে 'অঙ্ক' নাটকের ন্যায়। **ঘ.** 'ব্যায়োগ' নাট্যরীতিতে দেখা যায়, নায়ক খ্যাতনামা রাজর্ষি বা এই গুণ সংবলিত। নাটকের বিষয় থাকে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। স্ত্রীচরিত্রের সংখ্যা কম থাকে। রস সাধারণত শান্ত, শৃঙ্গার অথবা হাস্য হয়ে থাকে। তবে উপর্যুক্ত বর্ণনানুসারে চৈতনদেব-অভিনীত যে নাটকের বর্ণনা আমরা পাই তাকে আমরা কোনোভাবেই 'অঙ্কীয়া নাট', 'অঙ্ক', 'ব্যায়োগ', 'ভাণ' পর্যায়ে ফেলতে পারি না। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, চৈতনদেবের উপযুক্ত নাট্য-অভিনয় রীতিটি ছিল সংস্কৃত 'অঙ্ক' রীতির আলোকে এক মিশ্রিত নাট্যরীতি। এখানে 'অঙ্ক' পদ্ধতির সাথে মিশ্রিত হয়েছিল উপরূপকের 'ঈহামৃগ' ও 'নাট্যরাসক'-এর উপকরণ। এরূপ অভিমতের কারণ, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* চর্চার ধারা বাংলায় পূর্বাপরই ছিল এবং এ বিষয়ে প্রবন্ধের শুরুতেই আলোকপাত করা হয়েছে। নবদ্বীপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাক-চৈতন্য যুগ থেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রবর্তী ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্য-পার্ষদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিসেবী।

যেমন: জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান, নাট্যাচার্য চন্দ্রশেখর আচার্য, চৈতন্য স্বয়ং এবং তাঁর পার্ষদেরা। এঁরা সবাই সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রকরণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং, চৈতন্য-অভিনীত নাটকে সংস্কৃত নাটকরীতির ব্যবহার খুব স্বাভাবিক বিষয় বলেই আমরা মনে করি। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা চৈতন্যের নাট্য-অভিনয় কৌশলে অভিনব মুন্সিয়ানার পরিচয় পাই, তাহলো – অভিনেতাগণের পারস্পরিক সংলাপ বা বিষয়বস্তুর উপস্থাপনকৌশল সংস্কৃত নাটকরীতির হলেও তিনি আবহমান বাংলার প্রচলিত উপস্থাপনরীতির সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলা ভাষা। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যরীতির সাথে লোকনাট্যধারার প্রচলিত উপস্থাপনরীতির মিশ্রণে তিনি বাংলা নাটককে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনবত্ব দান করেছিলেন।

ঘ. মঞ্চব্যবস্থাপনা রীতি

মঞ্চব্যবস্থাপনা মূলত একটি মৌন শিল্পকর্ম। শিল্পকর্মের প্রকাশ ও বিকাশের স্বার্থেই উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে অভিনয় স্থান বা মঞ্চের। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, ধীরে ধীরে গ্রিক-রোমান সভ্যতার এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথিয়ান যুগ, রেস্টোরেশন যুগ ধরে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও মঞ্চব্যবস্থাপনা রীতিতে পূর্ণতা এসেছে বিবর্তনের পথ ধরে। মূলত বাংলার প্রথাগত ঐতিহ্যই অভিনয় স্থান বা মঞ্চকে সংগঠিত করেছে এবং দিয়েছে পূর্ণতা। এ বিষয়ে একজন মঞ্চগবেষকের মন্তব্য :

> আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকনাট্য ঐতিহ্যের নিজস্ব পরিবেশনা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে মঞ্চগৃহ সমৃদ্ধ হয়েছে, সেসবও অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো সৃজনশীল ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে নিজ নিজ দেশ এবং আঞ্চলিক গৌরববোধে। (গোলাম সারোয়ার, ২০১৮ : ১৫)

গবেষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংস্কৃতির যে বিকাশমান ধারা, তার মধ্যে লোকঐতিহ্যের পরম্পরার গুরুত্ব তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়। যার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সামষ্টিক সংস্কৃতির গর্ভগৃহ।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য তাঁর অভিনীত বিভিন্ন নাট্যক্রিয়ায় মঞ্চব্যবস্থাপনা রীতিতে সংস্কার এনেছিলেন। আধুনিক নাট্যধারায় যে 'প্রসেনিয়াম' মঞ্চ-ধারণা তা আমরা নীলাচলপর্বে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়ে দেখি। আর নবদ্বীপপর্বের নাট্যক্রিয়ায় দেখা যায় 'ইনকা' পদ্ধতির মঞ্চ বা অভিনয় স্থান প্রস্তুত করতে। তবে তা হুবহু 'ইনকা' পদ্ধতির মঞ্চ ছিল না। আমরা ধারণা করি, দক্ষিণ ভারতের 'ইয়াকশাগানা' বা যক্ষগান মঞ্চায়ন-রীতির বা কৌশলের সংমিশ্রণ তাতে ঘটেছিল। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় 'রুক্মিণীহরণ ও ব্রজলীলা' নাট্যক্রিয়ায় যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল তার যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায় *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে*। বৃন্দাবন

দাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, কাথিবার চাঁদোয়া টানিয়ে অভিনয়-স্থান প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং বৃত্তাকার মঞ্চব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। যেহেতু আসরীয় রীতিতে অভিনয় করা হয়েছিল তাই আমরা একে এরিনা নাট্যমঞ্চের আদিরূপ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

চৈতন্য-অভিনীত মঞ্চ ব্যবস্থাপনা

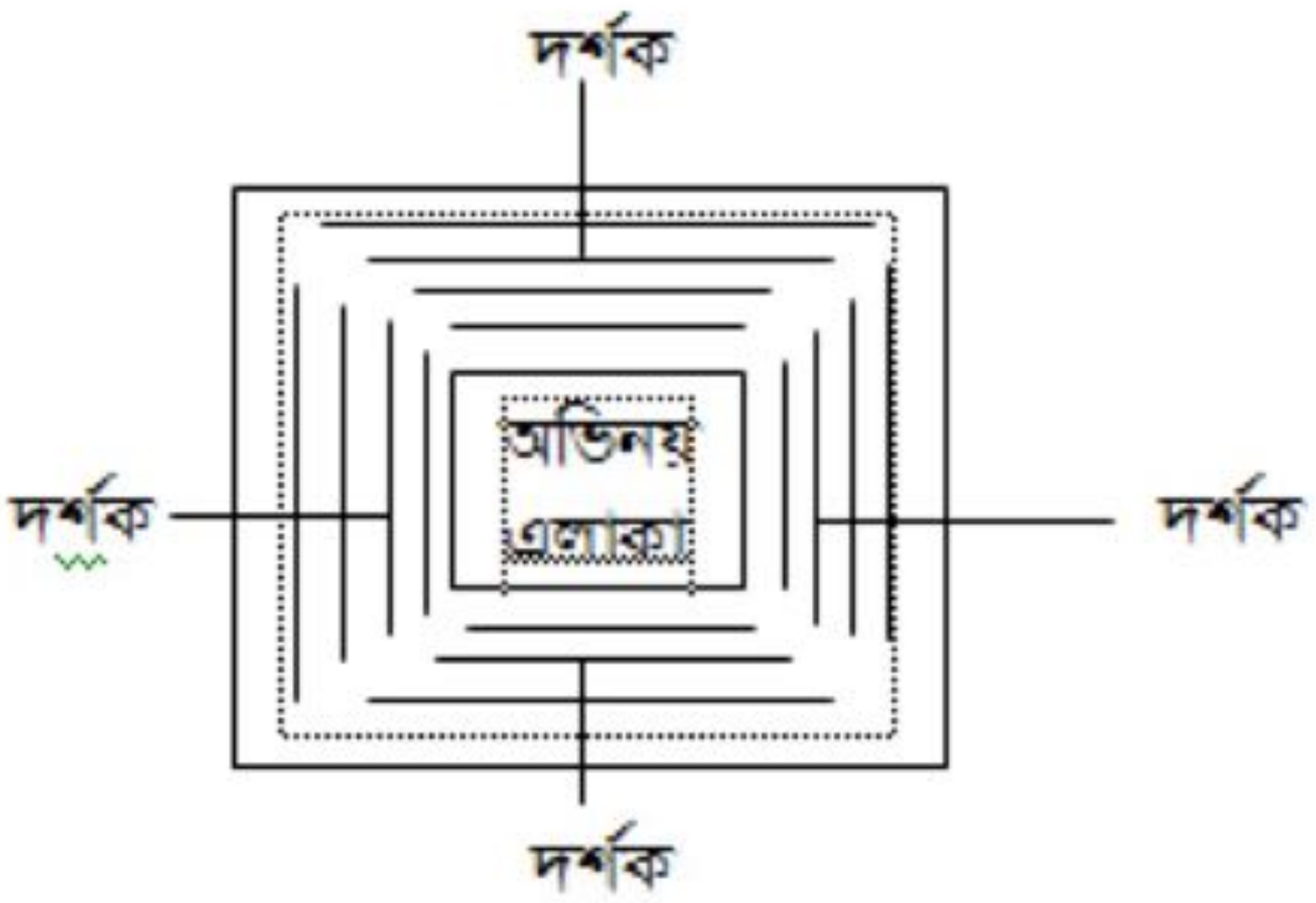

আধুনিক এরিনা নাট্যমঞ্চ

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ওপেনএয়ার-এর ট্রাডিশনাল যাত্রামঞ্চের সাথে চৈতন্য-অভিনীত নাট্যক্রিয়ার মঞ্চব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমরা এই ধারণা পোষণ করলে বোধ হয় খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না যে, প্রসেনিয়াম মঞ্চ-ধারণার যে আধুনিক সংস্করণ ওপেন থ্রাস্ট বা থ্রাস্ট মঞ্চের যে বিন্যাসরীতি তার পূর্বাপর একটি সূত্র চৈতন্যের মঞ্চব্যবস্থাপনারীতিতে দেখা যায়। নবদ্বীপ ও নীলাচল পর্বের নাট্যক্রিয়ায় ব্যবহৃত মঞ্চ ব্যবস্থাপনা রীতি পর্যবেক্ষণ ও জীবনীকারের বর্ণণায় তার সূত্র পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি চৈতন্যদেবের নাট্যক্রিয়ায় আধুনিক কমিউনিটি থিয়েটারের অন্তর্নিহিত মাত্রাকে অনুভব করা যায়। যেখানে 'মানুষের জন্য শিল্প' মানুষকে দিয়েছিল মৌলিক ও মানবিক অধিকার বিষয়ক সচেতনতা এবং গড়ে দিয়েছিল দার্শনিক ও নান্দনিক ভিত।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাস নাট্যক্রিয়ার অপরিহার্য বিষয় 'রূপসজ্জা'র প্রসঙ্গও অবতারণা করেছেন। তবে একাধারে রূপ ও দেহসজ্জার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন লোচন দাস তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে। (লোচন দাস; ১৩৮৮ : ৪৩) একক ও দ্বৈত অভিনয়ের বর্ণনায় উঠে এসেছে অভিনেতাদের মুন্সিয়ানা। সংলাপ সৃষ্টিতেও তাঁদের পারদর্শিতা এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োগ ছিল লক্ষণীয় ব্যাপার। নবদ্বীপ ও নীলাচল পর্বের নাট্যক্রিয়ায় সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল সঙ্গীত। সঙ্গীত পরিচালনার ভার ছিল মুকুন্দ দত্তের ওপর। মুকুন্দ-ভ্রাতা বাসুদেব দত্তও ছিলেন। আরও ছিলেন – ঘোষ ভ্রাতারা (মাধব, বাসুদেব)। নাট্যক্রিয়ায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল আনন্ধ, ঘন ও শুষির গোত্রীয় যন্ত্রসমূহ। এগুলোর মধ্যে ছিল মদৃঙ্গ, শ্রীখোল, শঙ্খ,

জয়ডাক, ঢোল, কাহাল, পাখোয়াজ, মহুরী, ডম্ফ বা ডফ ইত্যাদি। (কর্ণপুর, ১৯৭৪ : ১১৫-১১৭) দর্শক সারিতে নারী-পুরুষ উভয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। (বৃন্দাবন, ১৩৬৯ : ২৭০-২৭৪) আসরীয় রীতিতে অভিনয়ের কারণে দর্শকেরা গোল হয়ে বসতেন। গায়ক, দোহার মঞ্চেই থাকতেন এবং অভিনয় শেষ হলে তাদের প্রস্থান ঘটতো।

পরিশেষ

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থে চরিতকারেরা নাট্যক্রিয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তার সাহিত্যমূল্য যাই হোক না কেন, বাংলা নাটকের ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান সংযোজন। তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহ নাট্য উপাদানে ভরপুর। যদিও এসব ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে উপলক্ষ্য হিসেবে, অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মহিমা, তাঁর দর্শন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে। খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্রিয়াকাণ্ডে-অনুষ্ঠানে, আচারে-বিচারে অন্ত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল; চৈতন্যদেবে এসে তার সরলীকৃত পথ প্রস্তুত হয়। ঐক্য স্থাপিত হয় ভক্তিবাদ ও বহমান সংস্কৃতিতে। বৈষ্ণবীয় সাধ্য-সাধনায় সংযুক্ত বিষয়াবলি একদিকে যেমন ঐতিহ্যতাড়িত, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক। এই দুই বিষয়ভাবকে সমন্বয় করতেই চৈতন্যজীবনীকারেরা নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। তত্ত্বগত বিশ্লেষণে তা ধর্মীয় আবরণে মোড়ানো থাকলেও মধ্যযুগের এসব বিরল নিদর্শনে শিল্পরসপিপাসু মন সাহিত্যরসের আস্বাদন ঠিকই পেয়ে যান। ঐতিহাসিক বিবেচনায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্যদেবের অভিনব নাট্যক্রিয়া বাংলা নাটকের ইতিহাস অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ উৎসস্থল। চৈতন্যোত্তর কালে আধুনিক নাটকের যে প্রবাহ তাতে অনুদৃত হয়েছে ইউরোপকেন্দ্রিকতা। নাট্য-সমালোচকগলও সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বাংলা নাটকের উৎস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু বাংলা নাটকের যে বিশাল ভাণ্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোটা মধ্যযুগ ধরে; চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ তার এক অনন্য উদাহরণ। জীবনীকারেরা নাট্যতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় বা পরিসরে চৈতন্যদেবের নাট্যক্রিয়াকে উপস্থাপন না করলেও বাংলা নাটকের ইতিহাস ও তার উৎস-অনুসন্ধানে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থসমূহের গুরুত্ব বিচিত্র বিষয়ভাবের কারণেই তাৎপর্যমণ্ডিত; একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

টীকা

১ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিষয়ে অভিমত :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী চৈতন্যযুগ নামে অভিহিত। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে এই শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। শুধু সাহিত্য কেন, বাঙালীর ভৌমজীবন ও ভাব-জীবন, মর্ত্য-জীবন ও অধিমানসের জীবন — দুই প্রান্তেই নব প্রত্যয় ও আবেগের উল্লাস সঞ্চারিত হয়।

দ্রষ্টব্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৬৩

স্যার যদুনাথ সরকার 'চৈতন্য রেনেসাঁসকে 'A faint glimmer' বললেও তার অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন। যথা :

The Renaissance which we owe to English rule in the Ninenteenth Century had a precursor – a faint glimmer of dawn no doubt two hundred and fifty years earlier. দ্রষ্টব্য : Jadunath Sarker [ed] *History of Bengal (Vol. 11)*

ড. আহমদ শরীফের এ বিষয়ে মন্তব্য :

ষোল শতকে বৈষ্ণব মত উদ্ভবে যে ভাব বিপ্লব দেখা দিল তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণতা ও ক্রুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিক বোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসার, এবং রুচির বিকল্প ঘটেছিল; ... তাই ষোল শতক বাঙালী জীবনে ছোটখাট রেনেসাঁসের যুগ।

বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১০২।

[২] চৈতন্য-সময়কালে নবদ্বীপে বহুজনের বাড়িতে আরাধ্য দেবতার মন্দির ছিল। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থ যথাক্রমে : *কড়চা*, *চৈতন্যভাগবত*, *চৈতন্যচারিতামৃত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৩] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলমান আগমনের কিছু পর হতেই পূর্বভারতে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। বৌদ্ধ মতবাদের গ্রন্থ *কালচক্রতন্ত্রের* বিখ্যাত 'বিমলপ্রভা' নামক টীকায় দেখা যায়, বৌদ্ধ দেবতা কালচক্র ম্লেছদের বিরুদ্ধে গিয়ে হিন্দু বৌদ্ধদের একতাবদ্ধ হবার নেতৃত্ব দিতে। আবার শৈব সম্প্রদায়ের অনুসারীরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য লোককল্যাণমূলক বিচিত্র কর্মপন্থা অবলম্বন করলেন। পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকল ধনী জমিদারগণ, এরা শৈব সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, একই রকম কর্মতৎপরতা দেখা যায় শাক্ত, গাণপত্য, সৌরীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও। পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্য ধর্মীয় সহবস্থানকে অর্থপূর্ণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও কম ছিল না। দ্রষ্টব্য : R. S. Sarma [ed], *Indian Society : Historical probings : Essays in Honour of D. D Kosaambi*, Peoples publishing House, New Delhi. PP 188-189. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে : Pravat Mukherjee, *The History of Mediaeval Vaisnavism in Orissa.* Assian Educational Services, New Delhi, 1981, P. 73-91; P-123-147]

[৪] 'পাণ্ডু'–উৎকল ভাষার শব্দ। যার অর্থ, হাতে ধরে পদব্রজে ভ্রমণ বা গমন। 'পাণ্ডুবিজয়' বলতে শ্রীজগন্নাথদেবকে হাত ধরাধরি করে রথের উপর নিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। উৎকলে 'পাণ্ডু-বিজয়' পর্বটি এখনো রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

দ্রষ্টব্য : Probadh Chandra Sen, *Banglai Drama and stage*, *Indian Drama* Essay : Ministry of Information and Broadcastion, Govt. of India. Page-41.

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত কুমার ঘোষ (২০১৬)। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (চতুর্থ খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা

কবিকর্ণপুর, ত্রিদণ্ডী গোস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ [সম্পা.] (১৯৭৪)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রদয়ম্*, শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার [সম্পা.] (১৯৭৯)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২)। *মধ্যযুগে বাঙ্গালা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

গোলাম সারোয়ার (২০১৮)। *মঞ্চব্যবস্থাপনা*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৯৩)। বৃহৎ বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

নির্মল দাশ (১৯৯৭)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

নীহাররঞ্জন রায় (১৯৯৪), *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

বিজিত কুমার দত্ত (১৯৮০)। *প্রাচীন বাঙ্গালা ও মৈথিলী নাটক*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিজিত কুমার দত্ত (১৯৮৬)। *চৈতন্য জীবনকথা*, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা

বৃন্দাবন দাস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু [সম্পা.] (১৩৬৯)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (২০১১)। *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.] (১৪০২)। *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

লোচন দাস, ভগবানদাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ [সম্পা.] (১৩৩৮)। *চৈতন্যমঙ্গল*, বুড়ি আমবাগান, নবদ্বীপ।

সুকুমার সেন (১৯৮৪)। *নটনাট্যনাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা

সুকুমার সেন (২০০৪)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। সাহিত্যের শব্দার্থকোশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা

সেলিম আল দীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৭৮)। *চর্যাগীতিকোষ*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা

Bipinchandra Paul (1987). *Bengal Vaishnavism*, Calcutta

David William [Ed.] (1991). *Peter Brook and the Mahabharatea Critical Perspectives*, Routledge, PP. 58.

Jaeob Srampical (1994). *Voice to the Voiceless*, Monohor, New Dellhi

Jadunath Sarker [ed.] (1977). *The History of Bengal, Muslim period,* Janaki prokashan, Patna

P. Sorkin (1976). *Social and Cultural Dynamics*, Vol. 1

Swami Praggananananda (1979). *Musicof South Asian Peoples*, Ramkrishna Vedanta Math, Calcutta

Sheldon Cheney (1952). *Theatre : Three thousand years*, Newyork.